29 OCT 1995

দৈনিক জনকণ্ঠ ৩৪

তারিখ ..29 OCT 1995... পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৭...

শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে

সুনন্দা কবির

সম্প্রতি শহরের সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় গড়ে ওঠা এক বস্তিতে গিয়েছিলাম। এক এনজিও'র কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করতে। বাসিন্দারা সবাই পৌর করপোরেশনের সুইপার, বর্তমান পরিভাষায় ক্লিনার। এদেরই আট থেকে বারো বছর বয়সী বাচ্চাদের নিয়ে এনজিওটির কার্যক্রম। বাচ্চারা এখানে স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতায়ও তালিম নেয়। শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর খাদ্য, রাতকানা রোগ বা ডায়রিয়া ও এদের প্রতিকার—সবকিছুই ছেলেমেয়েদের অধিগত। কিন্তু এদেরই অধিকাংশের অবয়বে অপুষ্টি, অসুস্থতা এবং অপরিচ্ছন্নতার ছাপ প্রকট। তাছাড়া বস্তিবাসীদের সার্বিক পরিবেশ এমন যে জীবাণুমুক্ত হতে গেলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাই পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি জেনেও এই শিশুদের পক্ষে সে সমস্ত কতটুকু অভ্যাস রপ্ত করা সম্ভব সেটা বিচার্য এবং শুধু তত্ত্বজ্ঞান নয়, তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে গেলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন সেটা এ অবস্থার অধিকাংশেরই সাধ্যের অতীত।

ঠিক একই অবস্থা সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও। শুধু বর্ণকে আয়ত্ত করাই শিক্ষা নয়, যেমন শিক্ষা নয় তিন বা পাঁচ বছর কোন শিক্ষায়তনে সময় ব্যয় করা। অধিগত শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য নিয়ত চর্চার প্রয়োজন। এই আয়াসসাধ্য ব্যাপারটি ঘটবে তখনই যখন উৎসাহিত হওয়ার মতো কোন কারণ থাকবে, অর্থাৎ যদি শিক্ষানুপাতে প্রাপ্তবয়স্কের জন্য যুক্তগ্রাহ্য শ্রম এবং সম্মানীর ব্যবস্থা করা যায়। উপস্থিত অথবা প্রতিযোগিতার পরিসংখ্যান বা তার ঊর্ধ্বগতি নয়, শিক্ষার গুণগত মান-উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার স্থপতিরা কতটুকু চিন্তাশীল, যাঁরা প্রবর্তক তাঁরাই বা কতখানি সক্রিয় ও যত্নবান এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী আমাদের শিক্ষার স্থান কোন পর্যায়ে, সেটাই খতিয়ে দেখার সময় বহু আগেই পার হয়ে গেছে। তবুও ভূতের মতোই আমাদের পদদ্বয় কেবলই পশ্চাদ্দিকে ধাবিত।

আমরা নিয়তই এক জ্ঞানবিমুখ জাতি হিসাবে লাঞ্ছিত হচ্ছি। আমাদের জীবন থেকে ক্রমশই উধাও হচ্ছে সুস্থ জ্ঞানচর্চা এবং শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। অথচ শৈশব থেকেই স্বাধীন চিন্তা এবং মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটানো যায়, যায় শিক্ষাকে অধিগত করার আগ্রহ তৈরি করা।

দু'হাজার সাল নাগাদ যে গণমুখী শিক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা একটি বিরাট অংশ জুড়ে থাকবে। যারা এ পরিকল্পনার উদ্দিষ্ট সেই অসংখ্য দরিদ্র গ্রামবাসী অথবা শহরবাসী শিশুদের জন্য ওদের উপযুক্ত বিশেষ কোন শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ অথবা পর্যাপ্ত শিক্ষায়তনের এখনও কোন ব্যবস্থা সরকারীভাবে তো নয়ই, বেসরকারীভাবেও করা সম্ভব হয়নি। এই দায়িত্বের অনেকাংশেই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে বেশ কিছু এনজিও এবং কিছু কিছু এনজিও নিজেদের শিক্ষা কার্যক্রমে ভিন্নতর পদ্ধতি এবং শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করছে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায়। ব্র্যাক, প্রশিকা এবং গণসাহায্য সংস্থা উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে এবং বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রে ওদের লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলের এবং শহরের অগণিত দরিদ্র এবং ছিন্নমূল শিশু।

প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিকীকরণ নিয়ে গবেষণা স্বীকৃত ফললাভ করেছে। গণসাহায্য সংস্থার শিক্ষা পদ্ধতিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কিন্তু উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন এখনও রয়েছে। এযাবতকাল সরকারী বা বেসরকারী যত শিক্ষা উপকরণ তৈরি হয়েছে, তার সিংহভাগই স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সাধারণ শিশুদের জন্য। কিন্তু এই শিশুগোষ্ঠীর বাইরেও বিরাটসংখ্যক শিশু রয়েছে যাদের অবস্থান মানবেতর সীমানায়। তাছাড়া শহর এবং শহরগুলির বস্তিবাসী শিশু এবং কিশোররা তাদের বয়সের তুলনায় অধিক প্রাপ্তমনস্ক এবং জীবন অভিজ্ঞ। এদের অধিকাংশই গৃহভৃত্য, কাঁকামুটে, হোটেলবয় অথবা ইটভাঙ্গা কি জুতা পালিশ ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। এদের পেশা এবং পরিবেশের চিন্তা মাথায় রেখে কিছু কিছু বিষয় এদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মাদকাসক্তি এবং ধূমপান ও কুফল, বহুবিয়ে ও তালাক, যৌন অপরাধ, শিশু ও নারী অধিকার, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও প্রতিকার ছাড়াও কিছু কিছু বিপজ্জনক বস্তু ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত সাবধানতা ইত্যাদি বহু বিষয় এদের পাঠক্রমে দেয়া যায় এবং দেয়া যায় আকর্ষণীয়ভাবে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করেই।

কিন্তু শুধু শিক্ষালাভ নয়, শিক্ষালাভের পরে এই শিক্ষিত নাগরিকের শ্রমকে উন্নয়নমুখী করে তাকে একটা সুস্থ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় ফিলিপিন, শ্রীলঙ্কা অথবা প্রাক সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার হার বেশি, কিন্তু তুলনামূলকভাবে মাথাপিছু আয়ের হার কম। কারণ এই শিক্ষিত মানব সম্পদকে উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগ করা ততটা সম্ভব হয়নি যতটা হলে প্রাক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ থেকে প্রার্থিত ফললাভ ঘটে। শিক্ষিত মানব সম্পদ একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রথম এবং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সেটা নিশ্চিত করতে সর্বস্তরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়ে ভিত্তি তৈরি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা অর্জনে সহায়তা করে, মাধ্যমিক শিক্ষা দেয় বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের যোগ্যতা এবং উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়ক হয়। এছাড়া শিক্ষার সর্বস্তরে ছেলেমেয়ের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষিত মা-ই পারেন শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে। কারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে গৃহে এবং বিদ্যালয়ে সীমিত সম্পদ ও সুবিধাদি প্রাপ্তি সন্তানের জন্য নিশ্চিত করা যায়।

চাল, ডাল, গম দিয়ে নয়, শিক্ষার জন্যই শিক্ষালাভের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে শিক্ষা শুধু মুখে নয় মননে পৌঁছায় এবং সৃষ্টিশীল ও কল্যাণমুখী হয়। তবেই এই বিপুল জনসংখ্যা মূল্যবান সম্পদ হয়ে দেখা দেবে এবং এ দেশের লাখ লাখ দরিদ্র শিশু-কিশোরের শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে সর্বতোভাবে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তারপর কেই বা জানে কোন দিন সূর্য উঠবে কি না!